৪.৮. জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Caste System)

প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ মানুষের গুণ ও তদ্‌নির্দিষ্ট কর্ম অনুসারে নির্ধারিত হয়েছে, জন্ম অনুসারে নয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান তার ক্ষত্রিয়সুলভ গুণের জন্য ক্ষত্রিয়রূপে, ক্ষত্রিয়-সন্তান তার ব্রাহ্মণসুলভ গুণের জন্য ব্রাহ্মণরূপে চিহ্নিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করে দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয়রূপে ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছেন, আবার ক্ষত্রিয়বংশে জন্মলাভ করে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। বৈদিক উপনিষদীয় যুগে নারী এমনকি শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভের কাহিনী বিরল নয়। ঋষি যাজ্ঞবল্কের পত্নী মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। মহর্ষি গুরু গৌতম গণিকা জবালার (ভর্তৃহীনা জবালার) পুত্র সত্যকামকে দ্বিজোত্তমরূপে গণ্য করে ব্রাহ্মণরূপে স্বীকার করেন।

কাজেই, **প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথায় ক্রমোচ্চ নিয়ম অনুসরণ করা হলেও জাতি নিশ্চল ছিল না, সচল ছিল;** অর্থাৎ এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে চলাচলের পথে তেমন কোন বাধা ছিল না। সাম্প্রতিককালে সমাজতাত্ত্বিক কুলী (Cooley) তাঁর Social Organisation গ্রন্থে এপ্রকার শ্রেণীকে 'open class' বা 'মুক্ত' (সচল) শ্রেণী বলেছেন। **পরবর্তীকালে, উচ্চবর্ণের কতকগুলি স্বার্থান্বেষী মানুষের কূটবুদ্ধির ফলে এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে চলাচল নিষিদ্ধ হয় এবং 'জাতি' বংশগত 'নিশ্চল শ্রেণীতে' পরিণত হয়,** কুলী যাকে 'closed class' বা 'বদ্ধ শ্রেণী' বলেছেন। **বর্তমান ভারতের** জাতিভেদ প্রথার 'জাতি' মোটামুটিভাবে এক নিশ্চল সামাজিক শ্রেণী।

বর্তমান ভারতের জাতিভেদ প্রথাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়ঃ

(১) বংশানুক্রমিতা (Hereditary) : 'প্রত্যেক হিন্দু জন্মসূত্রে অনিবার্যভাবে তার জনকের জাতির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য। ধনসম্পদ অর্জনের দ্বারা অথবা মেধার

পরিচয়ের দ্বারা ব্যক্তি কোনভাবেই তার স্বজাতি-মর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারে না;'[১] অর্থাৎ **জন্মসূত্রের দ্বারা জাতি নির্ধারিত হয়।** ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, বৈদ্যের পুত্র বৈদ্য, কায়স্থের পুত্র কায়স্থ। 'ব্যক্তি যে জাতির সদস্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতির সদস্যরূপেই সে জীবন অতিবাহিত করে এবং সেই জাতির সদস্যরূপেই সে মৃত্যুবরণ করে।'[২]

(২) **ক্রমোচ্চতা** (Hierarchy) : ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হল, **উঁচু-নীচু মান বা মর্যাদা অনুসারে জাতিগুলি বিন্যস্ত থাকে।** প্রাচীন ভারতের চারটি বর্ণ বা জাতির মধ্যে সামাজিক মান-মর্যাদায় ব্রাহ্মণের স্থান সর্বোচ্চ, ব্রাহ্মণের নীচে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের নীচে বৈশ্য এবং বৈশ্যের নীচে শূদ্রের স্থান। আধুনিক কালেও ব্রাহ্মণের স্থান সর্বোচ্চ, ব্রাহ্মণের নীচে বৈদ্য, বৈদ্যের নীচে কায়স্থ এবং সর্বনিম্নে শূদ্রজাতি। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে সামাজিক মান-মর্যাদার দিক থেকে এই ক্রমোচ্চ নিয়মটি এখনও অব্যাহত আছে। কোন বিত্তবান নিম্নবর্ণের মানুষের বাড়িতে কোন ব্রাহ্মণ বেতনভুক পাচকরূপে কাজ করলেও জাতি হিসাবে ঐ ব্রাহ্মণ-পাচকটি নিজেকে তার বেতনদাতা অপেক্ষা উচ্চ সম্মানের অধিকারী বলে মনে করে।

(৩) **নিশ্চলতা** (Immobility) : **জাতি চলাচল সম্ভব নয়। জাতিমাত্রই নিশ্চল (closed caste system)। নিম্ন জাতির মানুষ কোন অবস্থাতেই উচ্চ জাতিতে উন্নীত হতে পারে না।** 'জাতির উঁচু-নীচু স্তর চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত'।[৩] কোন কোন অঞ্চলে আবার উচ্চজাতির মধ্যে ছুৎমার্গ অতি উগ্র ও কদর্যরূপে প্রকাশ পায়। দক্ষিণ ভারতের এবং পূর্বভারতের কোন কোন অঞ্চলে উচ্চ বর্ণের মানুষ নিম্ন বর্ণের শূদ্রদের অস্পৃশ্য ও অন্তজরূপে গণ্য করেন এবং মনে করেন যে শূদ্রদের স্পর্শে খাদ্য ও পানীয় অপবিত্র হয়। ঐ সব অঞ্চলে, উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত গ্রামে বা নগরে, শূদ্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন এসব অস্পৃশ্য ও অন্তজ বর্ণের মানুষের মানবাধিকার অর্জনের জন্যই আন্দোলন। তবে, আশার কথা যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে এবং মানুষের সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে জাতিভেদ প্রথার এই আবিলতা ক্রমশই অপসারিত হয়ে চলেছে।

(৪) **অন্তর্বিবাহ প্রথা** (Endogamy) : বিবাহাদি সম্পর্ক স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উঁচু জাতির সঙ্গে নীচু জাতির বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ তনয় কেবল ব্রাহ্মণ তনয়াকেই বিবাহ করতে পারে, অব্রাহ্মণ তনয়াকে নয়। 'শাস্ত্রীয় বিধান অমান্য করলে জাতিচ্যুতি ও সমাজচ্যুতি হবার সম্ভাবনা থাকে'।[৪] অবশ্য স্বজাতি বিবাহ

শাস্ত্রসম্মত হলেও সগোত্র-বিবাহ বা সপিণ্ড-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। সপিণ্ড-বিধি অনুসারে পাত্র-পাত্রীর ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষের মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ থাকলে সেই বিবাহ নিষিদ্ধ হবে। সহজ কথায়, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতি অভিন্ন হবে কিন্তু গোত্র ও পিণ্ড ভিন্ন হবে। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে শহরে ও নগরে, উন্নত শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি উন্মেষের ফলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। অধুনা অসবর্ণ বিবাহ বিরল ঘটনা নয়।

(৫) অপরাপর বিধি-নিষেধ (Other taboos): 'বিধি' হচ্ছে 'এটা করো' আর 'নিষেধ' হচ্ছে 'ওটা কোরো না।' এসব শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সঙ্গে কখনো ধর্মকে (religion) আবার কখনো নীতিকে (morality) যুক্ত করা হয়। এসব বিধি-নিষেধের বিষয় কখনো খাদ্যবস্তু, কখনো পাচক-পাচিকা, কখনো পানীয়, কখনো খাদ্য-পাত্র বা পান-পাত্র আবার কখনো খাদ্য-সঙ্গী, কখনো আবার নানাবিধ সামাজিক আচার-বিচার।[১] ধর্মীয় বিধান অনুসারে, উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে কতকগুলি বস্তু খাদ্য, কতকগুলি অখাদ্য। ছাগ মাংস খাদ্য কিন্তু গো-মাংস, মুরগীর মাংস অখাদ্য; হাঁসের ডিম খাদ্য কিন্তু মুরগীর ডিম অখাদ্য। উচ্চবর্ণের মানুষের স্বজাতির গৃহে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ বিধেয় কিন্তু নিম্নবর্ণ শূদ্রের গৃহে অন্ন-পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ; এমনকি ধূমপানও নিষিদ্ধ। উচ্চবর্ণের কোন মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের বাড়িতে ধূমপান করতে চাইলে তা স্বতন্ত্র হুঁকায় করতে হবে। তেমনি, উচ্চবর্ণের উৎসব বাড়িতে পঙতি-ভোজে উচ্চবর্ণের লোকেরা এক পঙতিতে এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা ভিন্ন পঙতিতে বসে আহার করবে— এটাই শাস্ত্রীয় বিধি। উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের একই পঙতিতে বসে আহার নিষিদ্ধ। এসব বৈষম্যের মূলে হচ্ছে এক ধর্মীয় ধারণা— 'সৃষ্টিকর্তা উচ্চবর্ণের মানুষকে শুদ্ধ মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি করলেও নিম্নবর্ণের মানুষকে খাদযুক্ত মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি করেছেন এবং সেকারণে নিম্নবর্ণের মানুষের স্পর্শে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি অশুদ্ধ ও অপবিত্র হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ভারতের অনেক অঞ্চলে, উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত অঞ্চলে, নিম্নবর্ণের মানুষের প্রবেশ নিষেধ।'[২]

'জাতের নামে এই বজ্জাতি' ভারতের সমাজ জীবনকে দীর্ঘদিন ধরে কলঙ্কিত করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধুনা শিক্ষার সম্প্রসারণের দ্বারা, রাষ্ট্রকর্তৃক নিম্নবর্ণের জন্য শিক্ষা ও 'সংরক্ষণ' ব্যবস্থা প্রচলনের দ্বারা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই কলঙ্কময় বৈষম্যকে দূরীভূত করার এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, ও নজরুলের মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ আজ এটা উপলব্ধি করেছে যে, অমিত শূদ্রশক্তিকে অবহেলা করলে, তাদের সঙ্গে 'অন্ন-পান' গ্রহণ না করলে, তাদের সঙ্গে নিজেকেও অপমানিত হতে হবে, সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

(৬) বৃত্তিভিত্তিক (Occupational): **প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা ছিল বৃত্তিভিত্তিক বা পেশাভিত্তিক।** প্রত্যেক জাতির জন্য বৃত্তি ছিল নির্দিষ্ট এবং বংশানুক্রমিক। যেমন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল যজন-যাজন, পূর্জাচনা ইত্যাদি কর্মের পৌরহিত্য; কুমোরের বৃত্তি মৃৎপাত্র নির্মাণ; ছুতোরের বৃত্তি কাষ্ঠবস্তু সৃজন; তন্তুবায়ের বৃত্তি বস্ত্রসৃজন; চামারের বৃত্তি পাদুকানির্মাণ; কামারের বৃত্তি লৌহবস্তু নির্মাণ; তেলীর বৃত্তি তৈলবীজ পেষণ করে তৈল সংগ্রহ ইত্যাদি। এসব জাতিগত বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক। তবে সাম্প্রতিককালে জাতিগত বৃত্তিব্যবস্থার কঠোরতা অনেকংশে হ্রাস পেয়েছে। ব্রাহ্মণ সন্তান এখন তার জাতিগত পুরোহিতবৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্যবৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, যথা— আইনবৃত্তি, চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি। নিম্নবর্ণের শূদ্ররাও এখন তাদের বংশগতবৃত্তি পরিত্যাগ করে ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য গ্রাম-সমাজে এই জাতিগত বৃত্তিব্যবস্থা এখনও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

(৭) **পদবীর গুরুত্ব (Importance of title): পদবী জাতির সামাজিক মর্যাদাকে সূচিত করে।** জাতির সঙ্গে জাতির উঁচু-নীচু পার্থক্যকে পদবীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কোন ব্যক্তির পদবী জানা গেলে মর্যাদা অনুসারে সমাজে তার অবস্থানকেও জানা যায়। যেমন, বাঙালীদের মধ্যে, কোন ব্যক্তির পদবী 'মুখোপাধ্যায়' অথবা 'দত্ত' অথবা 'দাস' জানা গেলে সমাজে তার মর্যাদা অনুসারে অবস্থানকেও জানা যায়।

তাহলে বলা যায় যে, যখনই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণী মর্যাদা জন্মসূত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়, ব্যক্তির ধর্ম (যথা— ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি) অথবা পদবী (যথা— ভট্টাচার্য, মণ্ডল ইত্যাদি) অথবা গাত্রবর্ণকে (যেমন— পাশ্চাত্যে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়) শ্রেণীর মর্যাদাসূচকরূপে গণ্য করে তদনুসারে শ্রেণী সদস্যদের প্রতি কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়, তখনই সেই সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসকে 'বর্ণভেদ' বা 'জাতিভেদ' বলা হয়।